অদ্ভুত বাড়ির রহস্য

সৌমিত্র বিশ্বাস

বুক ফার্ম

Adbhut Barir Rahasya
by
Soumitra Biswas

ISBN : 978-81-941930-3-6

No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher

© সৌমিত্র বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : অর্ক চক্রবর্তী
অলংকরণ : গৌতম কর্মকার

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৫০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

রিঙ্কি ॥ ১১

দরবারি কানাড়া ॥ ৩৬

বাগান, বাড়ি ॥ ৮৫

মাউথ অর্গ্যান ॥ ১৪৩

মুখোশ ॥ ১৫৮

শের-মন্ডল ॥ ১৭১

শ্বেতকরবী ॥ ১৮০

মায়া ॥ ২০৬

'না, স্যার,' অফিসার-ইন-চার্জ দিব্যেন্দু সেন বলল, 'যদ্দূর মনে হচ্ছে সাইকোলজিকাল কেস। ওর লাইফে একটা ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, ওর শ্বশুরকে নিয়ে।'

'কী ট্র্যাজেডি?'

'ওর শ্বশুর একটা জালিয়াত। নিজেকে বলে ডাক্তার— ডাক্তার বি ডি মন্ডল।'

'ডাক্তার? হোমিয়ো?'

'না স্যার,' মাথা নাড়ল দিব্যেন্দু, 'হোমিয়ো, অ্যালোপ্যাথি, কোবরেজি— মানে আমরা যা কিছু জানি— সেসব নয়। সে নাকি দৈব চিকিৎসক।'

'সে আবার কী?'

'মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে রোগ সারিয়ে দেয়, হোম-টোম করে সেই ছাই নিয়ে রোগীর গায়ে মাখিয়ে দেয়, তাতেই নাকি রোগ সেরে যায়।'

'এ তো পুরো ফেরেব্বাজি,' রক্তিম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

'সেইজন্যেই বললাম স্যার যে, লোকটা জালিয়াত।'

'যাকগে, যেটা বলছিলে। রিঙ্কির সঙ্গে শ্বশুরের কী হয়েছিল?'

'হয়েছিল মানে স্যার, ওর শ্বশুর ওষুধ দেবার নাম করে আদাড়-পাদাড় থেকে গাছপালা শেকড়বাকড় তুলে আনে। তো, সেরকমই একবার একটা কোন শেকড়

পারছিল না। সেটা মনে হতেই ভয়ের একটা কাঁপন ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে, সেইসঙ্গে শমীকের ওপরে রাগ ধরছে। আদেখলার মতো রোহিণী মুখার্জির সঙ্গে ভাব করতে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল?

হঠাৎই কেউ একজন আলতো করে ওর গালে হাত ছোঁয়াতেই মধুজা ভীষণভাবে চমকে উঠল। তারপরে দেখল হাওয়ার ঝাপটায় জানলার পর্দাটা উড়ে গালে লেগেছে। খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা, তাও তার বুকের মধ্যে ধকধক করে উঠল। চোখে ত্রস্ত শঙ্কা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জানলার পর্দার দিকে। একবার দুলে, ওকে ঝাপটা দিয়েই সেটা আবার স্থির হয়ে গিয়েছে। তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে পর্দাটা সরালেই তাকে দেখতে পাবে।

মানুষের পা পড়েনি। ধুলোয় ভরতি। সেগুলো টপকে ওরা একটা বড়ো বারান্দায় এসে পড়ল। নির্জন, নিভৃত বারান্দা। শুকনো পাতা বোঝাই হয়ে রয়েছে। ঠিক নীচে সেই বাগান, যেখানে ক-দিন আগের রাতে ছায়া দেখেছিল ওরা। কিন্তু, এটা কী হল? সমস্ত ফাঁকা, নির্জন, ধুলোয় ভরতি। এখন সেই গানের আওয়াজ থেমে গিয়েছে।

এবার? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আর্য। মধুজা মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না।'

'একটা কথা বলবে?' আর্য বলল, 'তুমি এই বাড়ির সম্বন্ধে এত কিছু জানলে কী করে?'

হাসল মধুজা। কষ্টের হাসি। বলল, 'বলছি। কেউই জানে না। এখন না বললে আর হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না। বছর চারেক আগে আমার ডেঙ্গু হয়েছিল। হেমারেজিক ডেঙ্গু। এতে রক্তনালিগুলো ফেটে যায়। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, শুনেছি আমি নাকি কোমায় চলে গিয়েছিলাম।

'সেইসময়ে আমি দেখেছিলাম যে, একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদে আমি আটকে

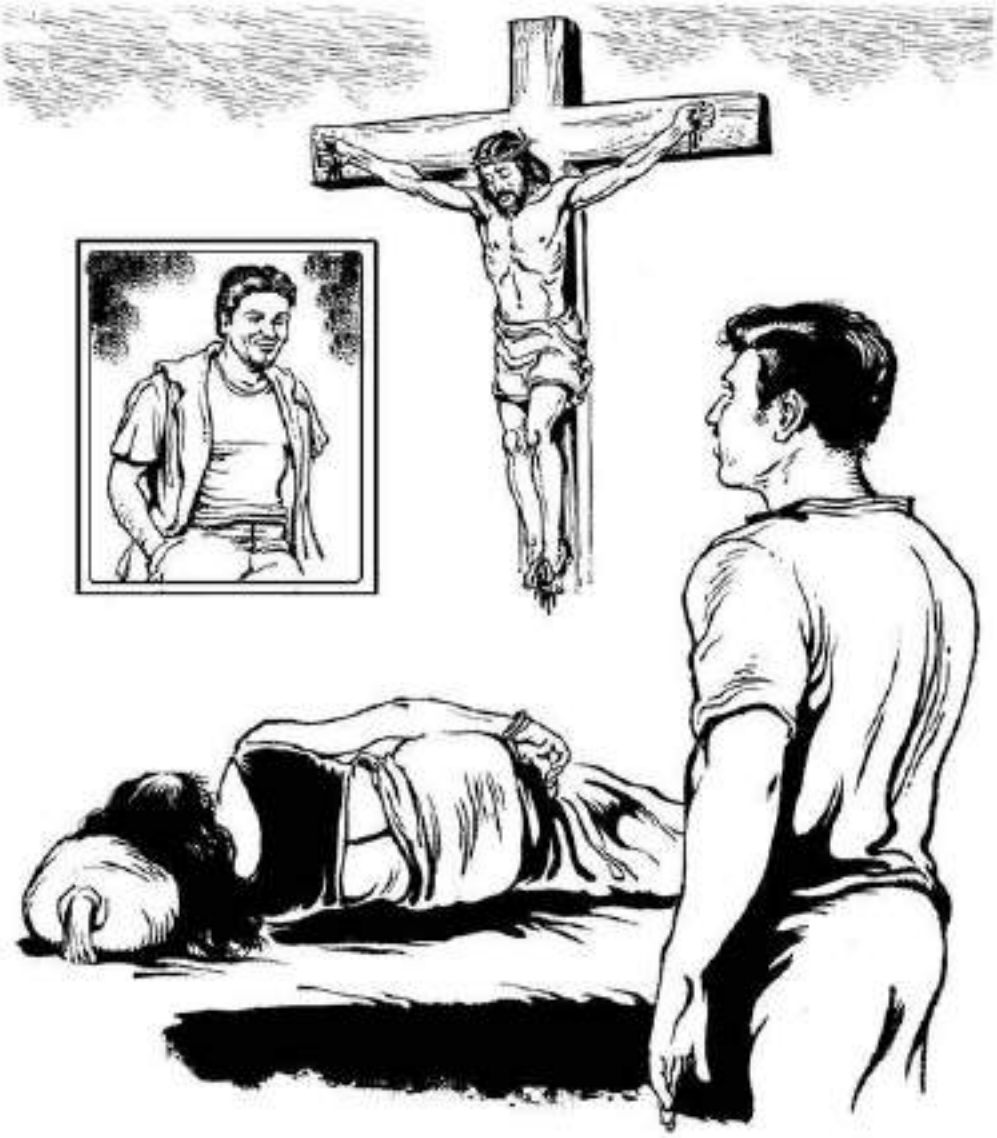

একবার আছাড় মেরে ফেলেও দিয়েছে। কিন্তু, আজ যে স্পন্ডিলাইটিস নয়, সেটা আমি ভালো করেই জানি।

কোনো গতিকে বাকি রাতটা কাটল। জানলা দিয়ে আলো এসে, যিশুর মুখে পড়তেই চারপাশটা কেমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু, ডিয়েগো কোথায়? কাল যে অবস্থায় দেখেছি, তারপরে আরও তিন পেগ বা বেশিই চড়েছে। চড়িয়ে কোথায় উলটে পড়ে আছে, কে জানে।

কিন্তু, আমাদের তো যেতে হবে। শেষে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। সামনে কাউকে দেখতে পেলে ডিয়েগোর খোঁজ করে নাহয় ওর বাড়িই চলে যাব। ওরকম মার্কামারা লোককে যে কেউই চিনবে।

চিনতে পারলও। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দেখতে পেয়েছিলাম ছোঁড়াটাকে।

তিন-কামরার ফ্ল্যাটে মেয়ে, বউ আর বুড়ো মাকে নিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা যদি এরকম নির্জন একটা জায়গায় এসে পড়তে হয়, তাহলে মন থেকে গুছিয়ে নিতে, মানিয়ে নিতেও তো একটা সময় লাগে। কাল সেটাই হয়েছিল আর কি!

নিরঞ্জনের আনা গরম গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে বেরোলাম। ওই হোটেলটাও খুব দূরে নয়। কাজেই দুপুরে নিরঞ্জনকে দিয়ে খাবার আনানোর দরকার পড়ল না। নিজেরাই চলে গেলাম।